নবম অধ্যায়

বাংলা কাব্যনাট্যে মিথের বিবর্তন

নবম অধ্যায়

বাংলা কাব্যনাট্যে মিথের বিবর্তন

বহিরঙ্গে কাব্য এবং অন্তরঙ্গে দ্বন্দ্ব কাব্যনাট্যের পরিচয় । বাংলা সাহিত্যে কবিতার প্রভাব সুগভীর । সেইজন্য সংলাপ রচনায় কবিতা ব্যবহার হয়েছে বহুকাল । পৌরাণিক নাটকে অধিকাংশ আবেগ বহন করত কবিতা ।

আধুনিক যুগেও নাটক লিখতে কবিতার আঙ্গিক নিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কথাকোবিদ । তবে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সব শাখার মতো এখানেও পথিকৃৎ । তিনি কবিতা ও নাট্যাংশ এমন ভাবে মিশ্রিত করেছেন যে কেউই কারো মর্যাদা ভঙ্গ করে নি । দুইয়ে মিলে এক হয়ে উঠেছে ।

বাংলা কাব্যনাট্যে কয়েকটি মিথিকাল চরিত্র বার বার এসেছে । কর্ণ, কৃষ্ণ, অর্জুন । কখনও একসঙ্গে কখনও বিচ্ছিন্নভাবে এঁদের পাওয়া যায় । বিভিন্ন কবির দ্বারা এঁদের যে ভিন্নতর মাত্রা (Dimension) পাওয়া যায় তাদের মধ্যে একটি বিবর্তনের ধারা দেখা যায় ।

একক অর্জুনকে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যে । এখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণছায়ায় আচ্ছন্ন নন।নিজ স্বরূপে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদার মধ্যে একটি মিথ উপলব্ধি করেছিলেন । একদা পুষ্পভারে সজ্জিত বৃক্ষ দেখে তাঁর মনে হয়েছিল নারীরূপের সার্থকতা কিসে । কিন্তু আলোচনার লক্ষ্য অর্জুন । এ নাটকে মহাভারতের অর্জুনকে আমরা পাই । রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবায়ন করেন নি । তরুণ অর্জুন পারিবারিক নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করেছিলেন । যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর নিভৃত অবসর যাপনে তাদের কক্ষে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন । অতএব তার শাস্তি স্বইচ্ছায় শিভালরির সঙ্গে বহন করেন । শুরু হয় নিরুদ্দেশ ভ্রমণ । সুন্দরী চিত্রাঙ্গদাকে দেখে মুহূর্তে তিনি স্বরোপিত ব্রহ্মচর্য ত্যাগ করেন, 'আমি তো আচারভীরু নারী নহি / শাস্ত্র বাক্যে বাঁধা । চিত্রাঙ্গদা তাঁকে আকর্ষণ করার জন্য মদনের কাছ থেকে এক বৎসরের সৌন্দর্য বর ভিক্ষা লাভ করেছিলেন । কিন্তু দীর্ঘ কর্মহীন শুধুমাত্র অলস প্রেমময় জীবন শীঘ্রই বীর অর্জুনকে ক্লান্ত করে তোলে । বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদার কথায় তিনি উৎসাহিত হন । অবশেষে চিত্রাঙ্গদার আত্মপরিচয় দান ও

উভয়ের মিলন । প্রথমে একটি দীর্ঘ কবিতা পরে সম্পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদা রূপায়িত হয় ।

এখানে নাম ভূমিকায় চিত্রাঙ্গদার ভূমিকাই বড় । তাঁর প্রেম, রূপের দ্বারা প্রেমিককে প্রবঞ্চনা করার আত্মগ্লানি, পরে পূর্ণ নারীত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ । অর্জুন তাঁকে সহায়তা করেছেন আত্মপ্রতিষ্ঠায় । অর্জুন চরিত্র জটিল নয়, কিন্তু তিনিও আধুনিক মানসের ফসল বলে তাঁর মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা আসে, 'কেন রে ক্লান্তি আসে -' । তাঁর চরিত্র রূপায়ণে প্রাচীন বীরের মত যুক্তি, যে বীরবলে তিনি ইচ্ছামত কাজ করতে পারেন । চিত্রাঙ্গদার সৌন্দর্য দেখে তার ব্রহ্মচর্য যাপনের ইচ্ছা চলে গেলে বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা দ্বিধান্বিত হন না তিনি — "আমি তো আচারভীরু নারী নহি । শাস্ত্র মন্ত্রে বাঁধা ।" তবে তিনি মহৎ বীর বলেই তাঁর ইচ্ছাও নীচ জাতীয় নয় । মহাভারতের বীর অর্জুন, প্রেমিক অর্জুনকে এখানে দেখি । তবু একাল বলেই আত্মবিশ্লেষণের অলঙ্ঘ্য প্রকাশ, পরিশেষে কল্পনা ও বাস্তব মিলিত হওয়ায় তাঁর চরিত্রের পরিণতি লাভ করেছে।

চিত্রাঙ্গদার বহিরঙ্গ কাঠামোতে শুধু নয়, ভিতরেও পৌরাণিক প্রভাব এসেছে ।

(ক) তুমি ভাঙ্গিয়াছ ব্রত মোর । চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষ ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগ নিদ্রা অন্ধকার । (অর্জুন)

(খ) সেই দৃষ্টি
রবিরশ্মি সম চিররাত্রি তপসিনী
কুমারী হৃদয় পদ্মপানে ছুটে এল । (চিত্রাঙ্গদা)

তপস্যা বা যোগভঙ্গে প্রেমের প্রভাব ভারতীয় পুরাণে অতি পরিচিত । বুদ্ধদেব বসু 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থে অর্জুন প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কবিতা (বহুমুখী প্রতিভা, শিল্পীর উত্তর, অর্জুনের প্রতি কোন নামহীনা) লিখেছেন । কিন্তু বীর অর্জুন যখন হঠাৎ কোন অব্যাখ্যাত নিয়তির বিধানে সহসা বীর্যহীন হয়ে পড়লেন এবং মহাকুশলী কৃষ্ণের নিজের বংশধরগণ আত্মযুদ্ধে আত্মবিস্মৃত হয়ে একটি বিশাল সভ্যতাকে প্রেতপুরীতে পরিণত করল

তাঁরই সামনে, সেই মুহূর্তের অর্থাৎ মৌষল পর্বের নাটকীয়তা যুগপৎ বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসুকে কাব্য রচনায় প্রেরণা জাগিয়েছে। মহাভারতে এই পরিণতিকে বলা হয়েছে গান্ধারীর অভিশাপ। কিন্তু এ পাপের কথা ভুলে গেলেও দেখা যায় মানবসংসারে নেতা স্বয়ং নিজের জাতি ও দেশকে বাঁচাতে সমর্থ হন না, অসহায়তা কত প্রকট তার সাক্ষী আছে ইতিহাস। কৃষ্ণ ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে জীবন উৎসর্গ করে, চোখের সামনে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে দেখতে বাধ্য হলেন তাঁরই কুল পরস্পরকে হত্যার আনন্দে মেতে উঠেছে। ধর্ম নিষ্ক্রিয়। ব্যক্তিমনীষা ও জাতির ইতিহাসেও এই নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য প্রকাশের জন্য মিথের আশ্রয় না নিলে তার বিশাল গভীরতা ও পতনের যন্ত্রণা বোঝান সম্ভব হত না। বুদ্ধদেব বসু মৌষল পর্ব অবলম্বনে রচনা করলেন 'কালসন্ধ্যা' ও বিষ্ণু দে 'পদধ্বনি'। এমন কি যুগপ্রভাবে আত্মহনন বিষয়বস্তু হওয়ায় সমরেশ বসু তাঁর একটি উপন্যাসের নামকরণ করেন 'যদুবংশ'।

কালসন্ধ্যার নারকীয়তা শুধু হত্যায় নয়, চূড়ান্ত নৈতিক অধঃপতনে। নারী পুরুষ আপন আপন লাজলজ্জা বিসর্জন দিচ্ছে, বলাৎকার চলছে। সভ্যতার এ সংকটে এরকাও মারণাস্ত্রে পরিণত হয়। এ যেন প্রতীক হয়ে ওঠে। প্রকৃত বীর বীর্য হারান। অর্জুনের কিনাঙ্কিত বাহু তাঁর অঙ্গস্বরূপ গাণ্ডীব ধারণে অসমর্থ হয়। যিনি কখনও কোন অন্যায় বরদাস্ত করেন নি তাঁর চোখের সামনে যাদব নারীগণ দস্যুহস্তে আক্রান্ত হয়, এমন কি অনেকে স্বেচ্ছায় চলে যায়। অর্জুন বিক্ষিপ্ত ব্যাসদেবকে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত যন্ত্রণাকীর্ণ হৃদয়ে এর উত্তর জানতে চান।

কিন্তু কৃষ্ণ গীতার কৃষ্ণর মতই নিরাসক্ত, স্থিত প্রজ্ঞ।

"মহিলারা, বিলাপ করো না
এও নিয়মের অংশ, আদিষ্ট, অলঙ্ঘনীয়,
আঘাতের প্রত্যাঘাত, ধ্বনিজাত প্রতিধ্বনি,
লোষ্ট্রাহত জলের কম্পন শুধু।
....
জেনো, এই ধ্বংস — এও ভালো।"

অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণ

যা আছে, তা চিরকাল ধ্বংসের অতীত
যা নেই, তা কখনো ছিল না।"

বস্তুত: গীতার উল্লেখ প্রকারান্তরে আছে

"অর্জুন, আমি কি
তোমাকে বলেছিলাম এই কথা, কিংবা এর অনুরূপ কথা
কখনো – অতীতে ?
....
তুমি, পার্থ, কিছু প্রশ্ন করেছিলে আমাকে, হঠাৎ
কর্তব্যপরায়ণতা ভুলে গিয়ে, ঘটনার ঘূর্ণন থামিয়ে
আমি তার উত্তরও দিয়েছিলাম

এই ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির লক্ষণে এই মহাকাল সন্ধ্যাতেও কৃষ্ণকে ট্র্যাজিকরূপ দেখা যায় না। কারণ তাঁর তো সংশয় নেই, দ্বিধা নেই। আধুনিক বিশ্বতত্ত্ব প্রণেতাকে তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। মানবীয়তা অর্জুনে আছে বলে তাঁর পরাজয়ের হাহাকার ধ্বনিত হয়। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে প্রচন্ড বেদনার আবেগে তিনি সান্ত্বনার জন্য ছুটে চলেন কারণ কালের নির্মম নিয়মে কৃষ্ণ আজ তাঁর পাশে নেই। অর্জুন বীর হলেও কৃষ্ণ ছাড়া তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই বলে আধুনিক অর্থে তিনি নায়ক হতে পারেন নি। ব্যাস তাকে শোনান শাশ্বত কালের বিধি –

"শেখো :
কাল সেই গর্ভ, বীজ, ধাত্রী ও শ্মশান,
যা ঘটায়, নিরন্তর আবর্তনে, জন্ম, বৃদ্ধি, অবক্ষয়, অবলুপ্তি
আনে কীর্তি, এবং কীর্তির ধ্বংস
আনে, যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর,
কিন্তু যা নিতান্ত পুনরাবৃত্তি, শুধু বধ্যঘাতকের স্থান বিনিময়"

এবং "ককতোর 'ইনফার্নাল মেসিন'-এর তাইরেসিয়াস ঐয়নকে বলেন – বিধ্বস্ত অয়দিপাউস পরিবারের ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করো না, কেন না ওরা আর তোমার কেউ নয় – এখন তারা চলে গেল কবির অধিকারে – To the People, to the Poets.
কালসন্ধ্যা নাটকে ব্যাসও বললেন, "এই সব কুশীলব – ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার। একমাত্র অক্ষরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার।"

বিষ্ণু দে'র পদধ্বনিতে কৃষ্ণ অনুপস্থিত। কিন্তু 'বটের ছায়ার মত সেই সম্পূর্ণ মানবে'র অস্তিত্ব আছে স্পষ্ট হয়ে —

স্মৃতি তার দ্বারকায় অবসর বিনোদনে লোটে,
স্মৃতি তার কদম্ব ছায়া, যমুনার নীল জলে বৃথা মাথা কোটে।

এখানে অর্জুন প্রৌঢ়, 'অক্ষম বিফল'। সুভদ্রার কাছে তিনি প্রেমের বিহ্বলতার বেগে পলায়নের স্মৃতিচারণ করতে করতে বর্তমান যুগান্তরের পদধ্বনি শোনেন। এই যুগান্তর কোন 'নব অবতার' আনছে না, আনছে দস্যুদল 'উদ্ধৃত বর্বর'। ক্ষুব্ধ বেদনায় অজেয় বীর উপলব্ধি করছেন —

'ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ' .....
ব্যর্থ আজ গাণ্ডীব অক্ষয়।'

তিনি জানেন কালের ধারায়, কালের নিয়মে তাঁর পরাক্রম লোপ পেতে বাধ্য। কিন্তু এই জ্ঞান তো সান্ত্বনা জানায় না। সেইজন্য প্রথমে তিনি পদধ্বনি শুনেও আত্মবিস্মৃত থাকতে চেয়েছেন। মনে করতে চেয়েছেন এ পদধ্বনি কোনও উন্মত্ত অপ্সরার অথবা বিভ্রান্ত উর্বশীর কিন্তু এমে বাস্তবকে গ্রহণ করতেই হয়েছে তখন দেখেছেন ভোগী বিলাসী স্বার্থপর যাদব যুবাদলকে পরাজিত করতে লুব্ধ যাযাবরের দস্যুদল 'দুয়ারে এসে পৌঁছে গেছে।' অথচ যে অর্জুন অক্ষৌহিনী বীর শত্রুদের অবহেলায় পরাজিত করেছেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভীষ্ম, দ্রোণাচার্যকেও অস্ত্রচ্যুত করেছেন আজ তাঁর গাণ্ডীব গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই। আত্মবেদনায় কাতর তাই নিজের অক্ষমতার জন্য ভদ্রার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। মহাভারতে ভারতীয় অধ্যাত্ম শিক্ষা এইভাবে দেওয়া হয়েছে যে কিছুই চিরন্তন নয়। সবই সময়ের নিয়মে চলে যেতে বাধ্য। অথচ সেই পরিণতি যাদের ওপর নেমে আসছে তার মনঃসমীক্ষণ করেছেন আধুনিক কবি। বর্তমান যুগযন্ত্রণায় আমরা প্রাচীন আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারি না। এই যন্ত্রণার আর্তি প্রকাশ করার জন্য মিথের অলঙ্ঘ্য শক্তি গ্রহণ করতে হয়।

মহাভারতে কর্ণকে অর্জুনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ধনুর্ধর হিসাবে চিত্রিত করা হলেও তাঁর চারিত্রিক মহত্বের কথা কোথাও দেখান হয় নি। "কর্ণপর্বে ১৮ পরিচ্ছেদে অর্জুনকে কৃষ্ণ বলেছেন, জতুগৃহ, দ্যুতক্রীড়া এবং দুর্যোধন তোমাদের উপর যত উৎপীড়ন করেছেন, সে সমস্তেরই মূল দুরাত্মা কর্ণ। কৃষ্ণ অত্যুক্তি করেন নি।"[১] কিন্তু বাংলা সাহিত্যে অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র কর্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'কর্ণ চরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর' । তার কারণটি বোধহয় বিভূতিভূষণের কথায় ব্যাখ্যাত হতে পারে, "মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড় ভালো লাগে তাহার কাছে । ইহার কারণ কর্ণের উপর তাহার কেমন একটা মমতা হয় । রথের চাকা মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছে – এক হাতে প্রাণপণে সেই চাকা মাটি হইতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন – সেই নিরস্ত্র, অসহায়, বিপন্ন কর্ণের অনুরোধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া অর্জুন তীর ছুঁড়িয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন । ..... জীবন পথের যেদিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে, আশাহত দৈন্যতায়, বেদনায় করুণ ..... "[২] । কর্ণ তার বীরত্বের জন্য নয়, তাঁর ভাগ্যহত জীবনের জন্য প্রিয় চরিত্র ।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি পাই রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' কাব্যনাট্যে । অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে নিখুঁত নাট্যাশ্রয়ী এই কাব্যনাট্যে মধ্যযুগের শিভাল্‌রি, Gallant Knight-দের মত বীরত্বের ধারণার সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরিমন্ডল মিশে গেছে । গ্রীক নেমেসিসের মত কর্ণ অদৃষ্ট তাড়িত, সব থাকা সত্বেও কেবল মিথ্যা জন্ম পরিচয়ে আগাগোড়া কৌরবদের দাসত্ব করে গেছে, অবশ্য তাও তার মহানুভবতা । 'কুরুপতি কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে' তা কৃতজ্ঞতার । খৃস্টীয় গ্রেল লিজেন্ডের বীরত্বের মিথের সঙ্গে সাদৃশ ভাবনা । তার সঙ্গে আছে মানবজীবনের আদিম কামনা শৈশবে ফিরে যাবার ইচ্ছা –

> অস্ফুট শৈশব কাল যেন রে আমার । যেন মোর জননীর গর্ভের আধার
> আমারে ঘিরেছে আজি ।

বীর কর্ণ সপ্রত্যয়ে নিজের পরিচয় দেয়, 'অধিরথ সুতপুত্র, রাধাগর্ভজাত' হিসাবে । নাটকের শুরুতেই এই বাক্যের নাটকীয়তা এখানেই স্পষ্ট হয় যে এই মাতৃপরিচয়কে বৃত্ত করে সম্পূর্ণ কর্ণকুন্তীর 'সংবাদ' । সেইজন্য কুন্তী 'পুত্র মোর ওরে' বলার সঙ্গে সঙ্গে নি:সংশয় চিত্তে কর্ণ তাঁকে মা বলে স্বীকার করে নেয় । যদিও এই আচ্ছন্ন অবস্থাতেও তার যুক্তিবাদী মন ভাবে,

> কালি প্রাতে
> আরম্ভ হইবে মহারণ । আজ রাতে
> অর্জুন জননী কণ্ঠে কেন শুনিলাম
> আমার মাতার স্নেহস্বর ।

অতএব ধীরে ধীরে বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তন করে কর্ণ প্রশ্ন করে –

"কহো মোরে। আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে ।"

অন্যদিকে কুন্তীর মধ্যে আদিম মাতার সন্তান ক্ষুধা আবহমান সত্যের প্রতিধ্বনি তোলে –

"কর্ণ : কোথা লবে মোরে ?

কুন্তী : তৃষিত বক্ষের মাঝে, লব মাতৃক্রোড়ে ।"

এবং

"তাঁর মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী
অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধার সহস্র নাগিনী
জাগায়ে জর্জর বক্ষে .....

এবং

"পঞ্চপুত্র বক্ষে লয়ে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন, তবু হায়
তোরি লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়,
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে ।"

কিন্তু মহাভারতের সমগ্র কাহিনী প্রমাণ করে কুন্তীরও পুত্রস্নেহ স্বার্থহীন ছিল না । না হলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগের সন্ধ্যা ছাড়াও নিশ্চয় সময় নির্বাচনের অবসর পাওয়াই যেত । তিনি জানেন –

'তোরে লব বক্ষে তুলি
সে সুখ-আশায়, আসি নাই দ্বারে ।

কর্ণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সবিশেষ জানেন বলেই এ সময় কুন্তী তাঁকে কর্ণের 'নিজ অধিকারে ফিরাতে' এসেছেন । বলা বাহুল্য কর্ণ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন । মহাভারতে আছে, কুন্তী বিদুরকে বললেন, "অবিবেচক দুর্মতি কর্ণই দুর্যোধনের বশবর্তী হয়ে পাণ্ডবদের বিদ্বেষ করে, তার জন্যই আমার ভয় । কন্যাকালে যাকে আমি গর্ভে ধারণ করেছি, সেই কর্ণ কি আমার হিতকর বাক্য শুনবে না ?"[৩]

আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে কুন্তীকে চিরন্তন স্নেহবুভুক্ষু মাতাতে পরিণত করেছেন। কিন্তু মহাভারতের উদ্‌যোগপর্বে বর্ণিত কর্ণের মূল চরিত্র তাঁকে বিশেষ পরিবর্তন করতে হয় নি। শুধু যুগের প্রভাবে এসেছে তার মনঃস্তাত্ত্বিক আলোড়নের বিচিত্র চিত্র। তার মাতৃস্নেহ কামনা ও দুর্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞতার দায়বদ্ধতার সংগ্রাম। জয়ী হয়েছে আত্মসুখের পরিবর্তে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও বীরসত্তা। বীরের সদ্‌গতি লাভই তাঁকে চিরকালীন মহৎ মানবের সম্মান এনে দিয়েছে, যা প্রথম পার্থের কৃষ্ণের সংলাপে যার পরিচয় পাওয়া যায় —

এক মৃত্যু, যাতে আহত হবে সর্ব যুগ
এক অমরতা, দিনে দিনে উজ্জ্বলতর।

পরাজয়ের মধ্যেই কর্ণ চিরজয়ী হয়ে রইলেন মানুষের মনে। অর্জুন ব্যতীত অন্য চার ভাইকে হত্যা করবেন না এই কথা দিলেন। তাঁর ট্র্যাজিক উক্তি —

"আমি রব নিস্ফলের হতাশের দলে।"

নাটকটির আরম্ভে দাতা কর্ণ বলেছেন —

'আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া আর।
যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার।'

এই তাঁর ধর্ম। বীরত্বের এই ধারণাই কর্ণের ধর্ম। অনুভূতির ওপর কর্তব্যকে স্থান দেওয়া, চিরদিন মাতৃস্নেহে যিনি লালন পালন করলেন সেই সূতজননীকে পরিত্যাগ করে আপন জননীকে গ্রহণ করলেও তা হবে ছলনার নামান্তর। কারণ সেই আপন জননী রাজমাতা। এক সুকঠোর ধর্মবোধ তাকে মহত্ত্ব দিয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পার্থ নামকরণের মধ্য থেকেই চমৎকার নাটকীয়তার প্রকাশ। কুন্তী তথা পৃথার পুত্রর হিসাবে সব পান্ডবই পার্থ। কিন্তু তাঁর তৃতীয় পুত্র অর্জুন পার্থ নামে পরিচিত এবং অর্জুনের সমান ক্ষমতা বীরত্বে মিল আছে বলে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণও পার্থ ও কাল অনুসারে প্রথম পার্থ। উভয়ে উভয়ের প্রতি সদা শত্রুভাবাপন্ন —

রাখিলে বিচ্ছিন্ন করি অর্জুনে আমারে
তাই শিশুকাল হতে টানিছে দোঁহারে

নিগূঢ়ে অদৃশ্য পাশ হিংসার আকারে
দুর্নিবার আকর্ষণে। (কর্ণকুন্তী সংবাদ)

কিন্তু নামকরণের এই অভিনবত্ব ছাড়া প্রথম পার্থ কাব্যনাট্যটিতে বুদ্ধদেব বসু কর্ণ ও কুন্তী চরিত্রের মধ্যে নতুন কোনো ডাইমেনশন আনতে পারেন নি। এমন - কি ছন্দ ব্যতীত ভাষাতেও রবীন্দ্রপ্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। যেমন কুন্তীর পরিচয় জেনে কর্ণকুন্তী সংবাদে কর্ণ বলেন, 'তুমি কুন্তী। অর্জুন জননী।' আর এখানে কর্ণ বলেন, 'কুন্তী। অর্জুনের মাতা' অথবা অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শনীর বর্ণনা — কর্ণকে সিংহ ছাড়া অন্য কোনো বিশ্লেষণ কিছু মনে পড়ে নি।

'দুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির
ভীম ধরিবেন ছত্র,

স্থলে বুদ্ধদেব লেখেন —

'তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে চামর দোলাবেন যুধিষ্ঠির
ভীমসেন শ্বেতছত্র ধারণ করবেন' ইত্যাদি।

তবে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যটির পরিধি বিস্তৃত। তিনি সেইজন্য নিয়েছেন কুন্তী ব্যতীত দ্রৌপদী, কৃষ্ণ এবং সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি স্বরূপ দুই বৃদ্ধকে।

কুন্তী যে উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, দ্রৌপদীরও উদ্দেশ্য তাই যদিও বক্তব্য ভিন্ন। তিনি চান কর্ণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকুন। কারণ তিনি জানেন, 'শুধু কর্ণ আছেন পাণ্ডবের প্রতিশ্রুত শত্রু' 'রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য' 'লোকাচার তুচ্ছ' করে 'সংকোচ অনর্থক' ভরসা পেয়ে তিনি 'অদ্ভুতভাবে পরিচিত' অথচ 'মাত্র দুবার মাত্র চোখে দেখা' বৈরীপত্নী তিনি এসেছেন। কারণ তিনি 'অদৃষ্টবাদী নন'। আমি আস্থা রাখি চেষ্টায়।'

অথচ সেই চেষ্টা যখন তিনি করছেন, তখন আযুধ করেছেন নিজের আকর্ষণ। কর্ণ সম্বন্ধে তাঁর কোন উচ্চ মনোভাব নেই, তবু প্রয়োজনে আসতেই হয়েছে। অতএব নিজের আকর্ষণ-জাল বিছিয়ে তিনি অন্যান্য পার্থদের মতো তাঁকেও টানবেন, এমন একটি স্বৈরিণী-জনোচিত, কুটিল চরিত্রা নারীর মতো এগিয়েছিলেন দ্রৌপদী। ব্রাহ্মণগণ তাঁর ভ্রান্তি সংশোধন করে

দিয়েছিলেন। না হলে প্রথম থেকে তাঁর বৈরীভাবই দেখা গেছে। সর্বাংশে তিনি বৈরীপত্নী। তথাপি তিনি 'কোমল সুরে' কর্ণকে ডাকেন। এ নিশ্চয় ব্রাহ্মণদের কথায় ভুল ভেঙ্গে বলে নয়। তারপর নাট্যকার বার বার নির্দেশ দিচ্ছেন 'অন্তরঙ্গ সুরে, 'ঠোঁটের কাণে হেসে', 'চাটুবাক্যের ধরনে, 'কিন্তু সতর্কভাবে', 'কোমল সুরে', 'কটুভাবে' আবার 'ক্ষণকাল পরে, কটুভাবে' এবং এই সাক্ষাৎকার শেষ হয়েছে দ্রৌপদীর বিতৃষ্ণ উক্তিতে — 'অনিবার্য তোমার পতন। আমার দু:খ হয় তোমার জন্য।'

আমাদেরও দু:খ হয়। মহাভারতে যে ঘটনা ছিল না সেটি নিশ্চয় কবি কল্পনা করতে পারেন কিন্তু সে কি যাজ্ঞসেনীকে এত লঘু করে দিয়ে ? তিনি কর্ণকে পুরস্কার হিসাবে দিতে চান নিজের বন্ধুতা তাও স্বামীর বন্ধু হিসাবে এই বন্ধুতা প্রাপ্য — 'আমার স্বামীদের যিনি সুহৃদ, আমিও তাঁকে বন্ধু বলে মানি — কর্ণ আমি তোমার বন্ধুতা চাই।"

বরং কর্ণকে বুদ্ধদেব অনেক মহৎ করে আঁকতে পেরেছেন। তাঁর প্রেম, কামনা, সৌন্দর্যবোধ সব থাকা সত্ত্বেও তিনি —

শুধু অপেক্ষামান
সেই মহান, নিষ্করুণ পরীক্ষার জন্য,
যার মধ্য দিয়ে, অবশেষে
আমি পাবো আমার আত্মপরিচয়,
হতে পারবো নিজের কাছে প্রকাশিত — ও প্রমাণিত।

পরিণতমনা কর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণর সংলাপ এই কাব্যনাট্যটির অন্যতম আকর্ষণ। এখানে কৃষ্ণ সম্পূর্ণ মহাভারতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান —

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : মনে হয় তিনি ঋজু নন, বক্রস্বভাব।
প্রথম বৃদ্ধ : কিন্তু তাঁর মত সক্ষম কেউ নয় শুনেছি
তাঁর মতো মেধাবী কেউ নয় শুনেছি।

সেইজন্য কৃষ্ণ কর্ণকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলেন মানবিকতার খাতিরে। কর্ণ না থাকলে কৌরব পক্ষ দুর্বল হয়ে পড়বে এবং বেশি ক্ষতি হবার আগেই যুদ্ধ সমাপ্ত হবে। কর্ণ এখানে

কৌরবদের প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা বলেন নি। অর্জুনের প্রতি তাঁর 'তীব্রতম প্রেম' প্রকাশ পাবে 'হত্যার তুরীয়ানন্দে'। অত:পর, কৃষ্ণ যখন শান্তভাবে কর্ণ হত্যার পরিকল্পনা জানান তখন কর্ণের প্রতিক্রিয়া, 'নরশ্রেষ্ঠ – বিশ্বম্ভর'কে তাঁরই জন্য কুচক্রী হতে হবে, নেপথ্য থেকে মঞ্চে আসতে হবে, 'এক আশাতীত সম্মান দিলে আমাকে'। আসন্ন মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে কর্ণ যেন চিরকালীন ভক্তের মতো ভগবান কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করছেন। 'মহাজ্ঞানী, আমার শেষ নমস্কার তোমারই জন্য' এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন 'আর যেন ফিরে না আসি'। মহাভারতে কৃষ্ণ মানবরূপে অবতীর্ণ এবং তাঁর সমস্ত কর্মও মানবোচিত। কিন্তু যেহেতু কৌরব পক্ষ দুষ্ট, অতএব তাঁরা ছাড়া আর সকলেই কৃষ্ণকে ঈশ্বর রূপে জেনেছেন। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এবং ঈশ্বরকে যিনি মঞ্চে নিয়ে আসতে পারেন, সেই কর্ণের মহত্ব কোথাও ক্ষুন্ন হতে দেন নি বুদ্ধদেব।

সূত্র নির্দেশ

১। রাজশেখর বসু – কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ, ভূমিকা, পৃষ্ঠা - ৪৯। প্রকাশক এম.সি. সরকার এন্ড কোং।

২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় – পথের পাঁচালী, পৃষ্ঠা ৪৬, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনী।

৩। রাজশেখর বসু – ব্যাসকৃত মহাভারতের অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৩৫৫, উদ্‌যোগ পর্ব। প্রকাশক এম.সি. সরকার এন্ড কোং।